মোহাম্মদ মোহর আলী

ফাহমিদ-উর-রহমান

বাঙ্গালী মুসলমানের ইতিহাস পর্যালোচনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক মোহর আলী অনিবার্য এক নাম। তাঁর রচিত History of Muslims of Bengal দেশীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত গবেষণাধর্মী ইতিহাস গ্রন্থ। আরব বিশ্বের বাইরে ইসলামের প্রসার ও এর সাংস্কৃতিক প্রভাব নিয়ে গবেষণার জন্য ২০০০ সালে তিনি শাইখ ক্বারাদাওয়ী কিংবা শাইখ আলবানীর মত ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ে বাদশাহ ফয়সাল পুরস্কার লাভ করেন। বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের নিকট এই মহান ব্যক্তিত্ব ও বাঙ্গালী মুসলমানের জাতিস্বত্তা নিয়ে তাঁর চিন্তা পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য সঞ্চারণের এই প্রয়াস।

--- সম্পাদক

১

মোহাম্মদ মোহর আলী ছিলেন ধীমান ঐতিহাসিক। সমকালের বাংলাভাষী অধ্যুষিত এলাকার ইতিহাস ও সংস্কৃতির এক অনন্য সাধারণ পণ্ডিত। তাঁর ইতিহাস চিন্তা ও ইতিহাস চর্চা ছিল মূলতঃ মুসলিম সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ আশ্রিত। ইতিহাসকে তিনি কখনোই কতকগুলো ঘটনার ধারাবাহিক বিন্যাস হিসেবে দেখেন নি। মোহর আলী ইতিহাসের ভিতর দিয়ে বাঙ্গালী মুসলমানের জাতি হিসেবে বেড়ে ওঠার বিকাশ ধারাকে প্রত্যক্ষ করেছেন। ইতিহাসের ভিতর দিয়ে জাতীয়তাবাদ, জাতীয়চেতনা, আত্মপরিচয় প্রভৃতি মূর্ত হয়। মোহর আলী ইতিহাস চর্চার মাধ্যমে বাঙ্গালী মুসলমানের স্বরূপ অন্বেষার সেই চেষ্টাই করেছেন।

তাঁর ইতিহাস চর্চার আর একটি প্রেক্ষাপট আছে। পলাশীর বিপর্যয়ের পর ঔপনিবেশিক শাসক ও তাঁর বংশবদরা বাঙ্গালী মুসলমানের ইতিহাসকে কালিমালিপ্ত করে, সাজানো ইতিহাস দিয়ে চেপে রাখার চেষ্টা চালায়। মোহর আলী এই কুয়াশার তলা থেকে বঙ্গালী মুসলমানের প্রকৃত সত্তাকে নতুন মাত্রায় আবিষ্কার করে আমাদের সামনে হাজির করেছেন। মূলতঃ ঐতিহাসিক হলেও মুসলিম সংস্কৃতি ও মনন চর্চার বিভিন্ন দিগন্তে তিনি পরিভ্রমণ করেছেন। তাঁর এই পরিব্রাজক মনের কারণেই তিনি রাসূল (সাঃ) এর সীরাতের উপর কাজ করেছেন। কোরআন শরীফের তরজমা করেছেন। বিশেষ করে উনিশ ও বিশ শতকে সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের সমর্থনে প্রাচ্যবিদ্যার নামে পশ্চিমা পণ্ডিতরা রসূল (সাঃ), কুরআন শরীফ ও ইসলাম নিয়ে যে নেতিবাচক মূল্যায়ন শুরু করে তিনি তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থাদিতে সেসবের ধারাবাহিক জবাব দিয়েছেন। সেদিক দিয়ে মোহর আলী মনন ও সংস্কৃতির জায়গা থেকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার এক নতুন দিগন্ত সৃষ্টি করেছেন।

জীবদ্দশায় তাঁর বিশ্বাসের জন্য নিজ দেশে প্রভূত অবহেলা ও নিগ্রহের শিকার হয়েছেন। শেষ পর্যন্ত তাকে দেশান্তরী হতে হয়েছে। কিন্তু তাঁর প্রতিভার দ্যুতি ও বৈশ্বিকতা সেই নিগ্রহের দেয়াল মিসমার করে দিয়েছে এবং ইতিহাস ও মনন চর্চার জগতে তিনি আজ এক ধ্রুপদী আসনে সমাসীন।

২

মোহাম্মদ মোহর আলীর জন্ম ১৯২৯ সালের ১ জুলাই বাগেরহাট জেলাধীন ফকিরহাট থানার শুভদিয়া গ্রামে।[১] তাঁর পিতাঁর নাম মোহাম্মদ মোয়াজ্জেম আলী ও মাতা আয়াতুন্নেসা বেগম। মাত্র ছয় বছর বয়সে তিনি পিতৃহীন হন। এ সময় তাঁর মা মোহর আলীকে

নিয়ে মাতুলালয়ে চলে আসেন এবং মা ও মামার তত্ত্বাবধানে তাঁর লেখাপড়া শুরু হয়। সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত স্থানীয় মাদরাসা ও স্কুলে অধ্যয়ন করার পর ৮ম শ্রেণীতে তিনি বিখ্যাত ফুরফুরা মাদরাসায় ভর্তি হন। পরবর্তীকালে তিনি হুগলী মাদরাসা ও মহসিন কলেজে ভর্তি হয়ে পড়াশোনা করেন। ছোট বেলা থেকেই অত্যন্ত মেধাবী মোহর আলী বিভিন্ন পরীক্ষায় সাফল্যের নজীর রাখেন। কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলের জন্য হুগলী মাদরাসা কর্তৃপক্ষ তাঁর মাদরাসার বেতন ও হোস্টেল খরচ অবৈতনিক করে দেন।[২] হুগলীতে অধ্যয়ন কালেই তাঁর রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক চিন্তার স্ফুরণ ঘটে এবং তিনি মুসলিম লীগের নেতৃত্বে ভারতবর্ষব্যাপি মুসলমানদের স্বাধিকার আন্দোলন সংগ্রামে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন। নেতৃত্বের স্বাভাবিক গুণাবলীর কারণে কিশোর বয়সেই তিনি হুগলী মুকুল ফৌজের সম্পাদক নির্বাচিত হন এবং পরবর্তীকালে তিনি হুগলী ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ ও হুগলী মাদরাসার সমন্বিত ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। পরে তিনি বঙ্গীয় মুসলিম ছাত্রলীগের একজন নেতা হিসেবে ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনের সময় পাকিস্তানের পক্ষে মুসলিম লীগ প্রার্থীদের পক্ষে জোর প্রচারাভিযান চালান।

ভারত বিভাগের প্রাক্কালে মোহর আলীর বলীষ্ঠ ভূমিকার জন্য তখনকার বিখ্যাত রাজনীতিবিদ হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী, আবুল হাশিম ও শাহ্ আজিজুর রহমানের সাথে তাঁর গভীর হৃদ্যতা গড়ে ওঠে।[৩] দেশবিভাগের পর মোহর আলী হুগলী থেকে ঢাকায় চলে আসেন এবং কাজী নজরুল ইসলাম কলেজে ভর্তি হন। অন্যান্য বিষয়ের সাথে তিনি আরবি ও ইতিহাস অধ্যয়ন করেন। কাজী নজরুল ইসলাম কলেজেও তিনি ছাত্র ইউনিয়নের সম্পাদক নির্বাচিত হন। এর পর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে অনার্স ও এম এ ডিগ্রি নেন। ছাত্র জীবনের এই সময়টাতেও বরাবর তিনি রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন এবং মুসলিম জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে তাঁর স্থান কখনো ম্রিয়মান হয়নি।[৪] বিশ্ববিদ্যালয় জীবন সমাপ্তির পর মোহর আলী বেছে নেন শিক্ষকতা ও মনন চর্চার ঋদ্ধ জীবন। এই কারণেই রাজনৈতিক মোহর আলীর বদলে আমরা তাঁর মধ্যে পেয়েছি এক অনন্যসাধারণ ঐতিহাসিককে।

কর্মজীবনে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন কলেজে তিনি অধ্যাপনা করেন। ১৯৫৪ থেকে ১৯৫৫ পর্যন্ত যশোর মাইকেল মধুসূদন কলেজ (১৯৫৪-৫৫), ঢাকা সরকারী কলেজ (১৯৫৫-৫৬), চট্রগ্রাম সরকারী কলেজ (১৯৫৬-৫৭) এবং রাজশাহী সরকারী কলেজ (১৯৫৭) ইতিহাসের শিক্ষক হিসেবে কাজ করেন। ১৯৫৮ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে যোগ দেন। ১৯৬০ সালে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন School of Oriental and African Studies (SOAS)-এ পিএইচডিতে ভর্তি হন। তাঁর পিএইচডি অভিসন্দর্ভের শিরোনাম ছিল The Bengali Reaction to Christian Missionary Activities (1833-1857)। ১৯৬০ সালে এটি গৃহিত হয়। SOAS এ অবস্থানকালে মোহর আলী তাঁর সুপারভাইজার অধ্যাপক কেন বল হ্যাচেটের (Professor Ken Ballhatchet) বিশেষ অনুমোদন নিয়ে লিংকনস্ ইনে আইন অধ্যয়ন করেন এবং ১৯৬৪ সালে বারএট□ল ডিগ্রী অর্জন করেন। দেশে বিভিন্ন কলেজে শিক্ষকতাকালীন তিনি কয়েকটি বই লেখেন। এগুলো হচ্ছেঃ

১। A Brief Survey of Muslim Rule in India (1954)

২। Intermediate General History, 1st and 2nd part (1957)

৩। Islam in the Modern World (1956)

৪। আরবী কেতাব তাজরীদুল বুখারীর বাংলা তর্জমা (১৯৫৮)

৫। An Outline of Ancient Indo-Pak History (1960)

লন্ডন বিশবিদ্যালয় থেকে পিএইচডি করবার আগেই তিনি গ্রন্থ পাঁচটি প্রণয়ন করেন। দেশে ফিরে মোহর আলী ঢাকা হাইকোর্টে যোগদান করেন। কিন্তু এই ওকালতী পেশা তিনি দীর্ঘদিন আঁকড়ে থাকেন নি। কারণ তাঁর কাছে মনে হয়েছিল এটি তাঁর ভবিষ্যত বুদ্ধিজীবীতার জন্য প্রতিবন্ধক হয়ে উঠবে। ফলে তিনি পুনরায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা জীবনে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৯৬৯ সালে তিনি নুফিল্ড ফাউন্ডেশনের (Nuffield Foundation) এর বৃত্তি নিয়ে বৃটেন যান এবং পরবর্তী বছর ফিরে আসেন।

১৯৬৫ সালে তাঁর পিএইচডি অভিসন্দর্ভ The Bengali Reaction to Christian Missionary Activities, 1833-1857 গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ১৯৬৬ সালে The Autobiography and The Other Writings of Nawab Abdul Latif বইটি মোহর আলীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়।

বাংলাদেশ ত্যাগের পূর্বে ১৯৭৫ সালে তিনি তাঁর উল্লেখযোগ্য গবেষণা গ্রন্থ The Fall of Sirajuddawla এর পাণ্ডুলিপি প্রকাশের ব্যবস্থা করে যান। একই বছরে লন্ডনে মুসলিম কাউন্সিল অব ইউরোপের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সিম্পোজিয়ামে

মোহর আলী History of the Muslims of Bengal নামে একটি নিবন্ধ পাঠ করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত কয়েকজন সৌদি কুটনীতিক নিবন্ধটির বিষয়বস্তুতে চমৎকৃত হন এবং অধ্যাপক আলীকে রিয়াদের ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সৌদ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার ইসলামী ইতিহাস নিয়ে একটি গবেষণা পদ গ্রহণের অনুরোধ করেন। এই ভাবে মোহর আলীর জীবনের নবরূপান্তর ঘটে এবং তিনি সাধারণ ইতিহাস (General History) থেকে ইসলামী ইতিহাসের বিপুল ঐশ্বর্য নিয়ে গবেষণার প্রাসাদে প্রবেশ করেন। রিয়াদে অবস্থানকালে তিনি ভালো মতো আরবী ভাষাও আয়ত্ত করেন।

> ১৯৭৬ সাল থেকে ১৯৮৬ এই দীর্ঘ দশ বছর তিনি একটানা বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করেন, যার ফল হিসেবে প্রকাশিত হয় চারখণ্ডের বৃহদায়তন History of the Muslims of Bengal নামের ধ্রুপদী ইতিহাস গ্রন্থ। ইতিহাসের এই ঋদ্ধ ও প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনার ফলেই মোহর আলীর খ্যাতি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ছড়িয়ে পড়ে। এরপরে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁকে নতুন একটি গবেষণা পদ অফার করা হয়। এখানে তিনি ১৯৮৭ থেকে ১৯৯৮ পর্যন্ত গবেষণার কাজে সম্পৃক্ত থাকেন এবং যার ফল হিসেবে দুই খণ্ডে Sirat-al-Nabi and the Orientalists নামে বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করেন। এটি প্রকাশ করেছে মদীনার Center for the Service of Sunnah and Sirah. পরবর্তীকালে তিনি এ ধারার আরো একটি সম্পূরক গ্রন্থ রচনা করেন The Quran and the Orientalist: An Examination of Their Main Theories and Assumptions নামে।

মোহর আলী মদীনার King Fahad Complex for the Printing of the Holy Quran নামের প্রতিষ্ঠানটির সাথেও এক বছর যুক্ত ছিলেন এবং এই সময়েই তিনি কুরআন অধ্যয়নের দিকে বেশী আগ্রহী হয়ে ওঠেন। জীবনের শেষ দিনগুলোতে তিনি লন্ডনে স্থায়ী হয়েছিলেন। এ সময়েই তিনি তিন খণ্ডে রচনা করেন আরবী ভাষার সাথে অপরিচিত পাঠকদের জন্য A Word for Word Meaning of the Quran. মোহর আলী তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি History of the Muslims of Bengal গ্রন্থের জন্য ২০০০ সালে মুসলিম বিশ্বের নোবেল প্রাইজ বাদশাহ ফয়সল আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করেন। বইটির মৌলিকত্ব, গভীরতা ও বিশ্লেষণী তাৎপর্যের কারণে এবং মধ্যপ্রাচ্যের বাইরে মুসলিম সমাজ ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার এক অনন্য সাধারণ ইতিহাস রচনার জন্য মূলতঃ তিনি এ পুরস্কারটি পান।

২০০৭ সালের ১১ এপ্রিল এই ধ্রুপদী ঐতিহাসিক লন্ডনে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুর আগে তিনি রসূল চরিতের মদীনা অংশ রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন। মোহর আলী বোধহয় সেই সব পণ্ডিতদের একজন যাঁরা জীবদ্দশায় স্বদেশে অপাংক্তেয় হলেও বিদেশে হন সমাদৃত। এরা বিশ্বাসের কারণেই প্রবল প্রতিপক্ষের মোকাবিলায় দাঁড়াতে কুন্ঠিত হন না। এমনকি এরা প্রবল জন আবেগকেও তোয়াক্কা করেন না। এটাকে এক ধরনের Political Heresy প্রচলিত রাজনৈতিক চিন্তার বিপরীত বিশ্বাস বলা যায়। জন-আবেগের স্থায়িত্ব ক্ষণস্থায়ী। কারণ সাধারণ মানুষ গভীর বিষয় নিয়ে মাথা ঘামায় না। নদীর জোয়ার ভাটার মতোই এদের অবস্থান। কিন্তু বুদ্ধিজীবীদের সেসব বিষয় নিয়ে চিন্তা করলে চলে না। মোহর আলী ইতিহাস ও সংস্কৃতির জায়গা থেকে ১৯৭১ এর ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং তাঁর মতামত দিয়েছেন। তাঁর মতামতের যথার্থ্যতা কালে প্রমাণিত হয়েছে। তাঁর ইন্তেকালের পর ঢাকায় একটি স্বল্পখ্যাত ইংরেজী পত্রিকা Asia Post সম্পাদকীয় নিবন্ধে লিখেছিল: We mourn the death of this great son of Islam. He was one of the major scholars on history and Islam produced in the sub-continent. He was neglected in the country of his birth. With death, we hope his scholarly contribution will come to the fore and he will be given due honour.[৭] ইতিহাসের সামনে মিথ্যার জাল যতই সুন্দরভাবে বোনা হোকনা কেন, একদিন ছিঁড়ে যায়। মোহর আলীও ইতিহাসের গণ্ডির ভিতর দিয়ে তাঁর সুনির্দিষ্ট স্থানকে স্পষ্ট করেছেন এবং ইতিহাসের সদর রাস্তার উপর বাতিঘরের মত আলো ছড়িয়ে চলেছেন।

৩

History of the Muslims of Bengal বইটিকে বলা যায় মোহর আলীর ম্যাগনাম ওপাস। বাংলায় মুসলমান আগমনের কাল থেকে প্রায় সাতশ বছরব্যাপী (১২০৩-১৮৭১) দীর্ঘ সময়ের ক্যানভাসে তিনি বাঙ্গালী মুসলমানের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও জাতিসত্তা প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত তুলে ধরেছেন। এটাকে বাঙ্গালী মুসলমানের ইতিহাসবিষয়ক বিশ্বকোষও বলা যায়। সম্পূর্ণ প্রাথমিক সূত্র যেমন শিলালিপি। পর্যটকদের বৃত্তান্ত, মুদ্রার বিভিন্ন পাঠ, সমাজের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিদের চিঠিপত্র, সরকারি সনদ, ফরমান, গেজেটিয়ার থেকে অসংখ্য তথ্য সংগ্রহ করে তিনি এই অসাধারণ গবেষণামূলক গ্রন্থটি রচনা করেন। বাংলা, ইংরেজী, ফারসীর পাশাপাশি তিনি বইটি রচনার সময় আরবী সূত্রও ব্যবহার করেছেন। বাংলার ইতিহাস নিয়ে মোহর আলীর পূর্বে লিখেছেন স্যার

যদুনাথ সরকার (১৮৭০-১৯৫৮) ও রমেশ চন্দ্র মজুমদার (১৮৮৮-১৯৮৭)। কিন্তু মোহর আলী তাঁর বাঙ্গালী মুসলমানের ইতিবৃত্তের ভিতর দিয়ে উপরোক্ত দুইজন ঐতিহাসিকের ইতিহাস বিষয়ক চিন্তাকে কবুল করেন নি। বিশেষ করে ১৯৪০ এর দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত স্যার যদুনাথ সরকারের সম্পাদিত History of Bengal বইটিতে মুসলমানদের অনেকটা বিদেশী হিসেবে দেখানো হয়েছে। যদিও তিনি ভালো ফারসী জানতেন এবং তাঁর ইতিহাস বইটিতে ফারসী সূত্রের উপর যথেষ্ট নির্ভর করেছেন। অষ্টাদশ শতকে মুসলমানদের পরাজয়ে যদুনাথ সরকার উল্লসিত হয়েছেন এবং এটিকে তিনি বাঙ্গালীর রেনেসাঁর উত্থান পর্ব হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। পলাশীর প্রান্তরে সিরজউদ্দৌলাহর পরাজয়কে তিনি নতুন সূর্যের উদয় হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তাঁর ভাষা উদ্ধৃত করছিঃ ১৭৫৭ সালের ২৩ শে জুন ভারতের মধ্যযুগ শেষ হলো। আর শুরু হলো সে দেশের আধুনিক যুগ। ভারতের পুনর্জন্ম বা রেনেসাঁস সেদিনই শুরু হলো। আধুনিক যুগের যা কিছু ভালো, তাঁর সাথে থাকলো ইংরেজের আনা বাংলার আলো। বাংলার বাঙ্গালীরাই ভারতের অন্যান্য দেশকে আধুনিক বানাতে গেলো।[৮]

এ লেখার ইংগিত স্পষ্ট। ঔপনিবেশিক প্রভু ও তাঁর দেশীয় মোসাহেবদের সমর্থনে লেখা স্যার যদুনাথের বইটি দেশভাগের পর দীর্ঘদিন ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগের অবশ্য পাঠ্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত ছিল। অনেকে মনে করেন এ বইটি বাংলাদেশের কয়েক প্রজন্মের শিক্ষক ও ছাত্রদের মাথা গুলিয়ে দিয়েছে এবং ষাট দশকের বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ বিকাশের অন্যতম তাত্ত্বিক বীজ হিসেবে কাজ করেছে।[৯]

মোহর আলী স্যার যদুনাথের মত মুসলিম শাসনের অবসানকে উল্লাসের সাথে বিচার করেন নি কিংবা এটাকে রেনেসাঁর উত্থান হিসেবেও দেখেন নি। তাঁর কাছে সিরাজউদ্দৌলাহর পতন ইউরোপের হাতে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা বিপর্যয়ের দিন হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। তাঁর ভাষ্য উদ্ধার করছিঃ Siraj al-Daulah's fall heralded and typified the fall of the East to the West, of Asia to Europe. His struggle and fall represents the natural but unsuccessful resistance of the East to Western intrusion and domination. He did not succeed; but he did not fail the land. It is the land that failed him.[১০]

স্যার যদুনাথ তাঁর বইটিতে ত্রয়োদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত মুসলিম শাসনের একটি বিবরণী দিয়েছেন। কিন্তু এ বইটিতে কোথাও মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্যকে পৃথকভাবে দেখানো হয় নি; কিংবা মুসলিম ইতিহাসের সামাজিক-সাংস্কৃতিক দিকগুলোকে তুলে ধরা হয়নি। স্যার যদুনাথ তাঁর বইয়ে বাংলাকে একটা ভৌগলিক এলাকা ধরে তাঁর ইতিহাস লিখেছেন। এখানেই মোহর আলীর সাথে তাঁর মৌলিক পার্থক্য। ঐতিহাসিক হিসেবে মোহর আলী উপলব্ধি করেছেন যদিও মুসলিম শাসকরা এ অঞ্চলের সাধারণ জনগণের খুব কাছাকাছি এসেছিলেন এবং এর মধ্যে অন্যান্য ধর্মাবলম্বী যেমন হিন্দু ও বৌদ্ধরাও ছিল কিন্তু তারা কখনো এই সত্য উপেক্ষা করেন নি যে তারা একটি মুসলিম রাষ্ট্র ও শাসন ব্যবস্থার নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

এই ঘটনাটি বিশেষ করে প্রতিফলিত হয়েছে ১৪১৪ সালে ইলিয়াস শাহী সালতানাতের দুর্বলতার কারণে রাজা কংস কর্তৃক মুসলিম শাসন উৎখাতের ষড়যন্ত্রের ভিতরে। স্যার যদুনাথ এই ঘটনাটির ব্যাখ্যাকে মুসলিম ঐতিহাসিকদের পক্ষপাতিত্ব হিসেবে বাতিল করেছেন। মোহর আলী স্যার যদুনাথের ব্যাখ্যার সাথে একমত হন নি। তিনি লিখেছেনঃ Raja Kans was no innocent and unwilling participant in the episode, nor was he friend of the Muslims. Taking advantage of the position of influence in the Muslim court which Ilyas Shahi liberalism had afforded him, he made a deliberate and vigorous effort to emulate the founders of the Vijayanagar Kingdom in the south and to supplant Muslim rule in Bengal.[১১]

শুধু তাই নয়, মোহর আলী রাজা কংস কর্তৃক বাংলার শাসন ক্ষমতা দখলে নেয়ার পর এখানকার মুসলিম সমাজের বিপর্যয় ও দূরাবস্থা থেকে উদ্ধারের জন্য বিখ্যাত আলেম নূর কুতুবুল আলমের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার যথার্থ মূল্যায়ন করেছেন। বিশেষ করে এই অসাধারণ পণ্ডিতের ভূমিকা ছাড়া বাংলায় ইসলামের ভাগ্য সেদিন স্পেনের পরিণতি বরণ করতো। মোহর আলীর বইটির আরেকটি বৈশিষ্ট হচ্ছে বাংলার ইতিহাস কথাটাকে তিনি তৎকালীন ইতিহাসের প্রেক্ষিতে ত্রুটিপূর্ণ বিবেচনা করেছেন। বাংলায় মুসলমানের আগমনের পর থেকে এখানকার মুসলিম শাসন ও সমাজ ব্যবস্থা কমবেশী উত্তর ভারতের রাজনৈতিক উত্থান-পতনের সাথে গভীরভাবে জড়িয়ে ছিল। এমনকি বিভিন্ন সময় বাংলায় যখন স্বাধীন সালতানাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তখনও প্রভাববলয় থেকে বাংলা বিচ্ছিন্ন কোন জনপদ ছিল না। এটাকে তিনি ভারতীয় মুসলিম ইতিহাসের একটি অধ্যায় হিসেবে দেখেছেন। একটি বিচ্ছিন্ন ভৌগোলিক জনপদের ইতিহাস হিসেবে দেখেন নি।

একালের কিছু কিছু বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিক প্রমাণ করার চেষ্টা করেন বাংলা চিরকালই একটি বিচ্ছিন্ন সত্তা হিসেবে বিরাজ করেছে এবং উত্তর ভারতের প্রভুত্বের বিরূদ্ধে লড়াই করেছে। এক্ষেত্রে তারা স্থানীয় বার ভূঁইয়াদের ভূমিকাকে খুব উচ্চকিত করে তোলেন। মোহর আলী দেখিয়েছেন বার ভূঁইয়ারা ছিলেন মূলতঃ কিছু আফগান ও হিন্দু জমিদার। এদের উত্থান-বিকাশ, লড়াই-সংগ্রাম ও স্বার্থের বিভিন্ন রূপ ও চরিত্র ছিল। হিন্দু জমিদাররা আফগানদের বিরূদ্ধে বহুক্ষেত্রে মোঘলদের সহযোগিতা করেছেন। আফগানরা মোঘলদের সাথে তাদের বহুপুরনো রাজনৈতিক ও বংশীয় বিরোধে জড়িয়ে পড়েছে। এছাড়া বার ভূঁইয়ারা ঠিক কোন বাঙ্গালীত্বের চেতনায় এ লড়াই করেন নি, বরং তারা নিজেদের আধিপত্য রক্ষার জন্যই বেশী উদগ্রীব ছিলেন। অন্যদিকে এরকম লড়াইয়ের উদাহরণ সমকালের ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গায়ও অপ্রতুল নয়। তাই এটাকে বাঙ্গালীর মুক্তির সংগ্রাম বলা যেমন যুক্তিসম্মত না তেমনি ইতিহাসসম্মতও না।

তবে এটা সত্য, ভাষিক দিক দিয়ে বাঙ্গালী মুসলমানরা তখন থেকে ধীরে ধীরে একটি স্পষ্ট পরিচয়ের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। ষোলশ শতক থেকেই কিছু কিছু মুসলমান কবি লেখক বাংলাকে সাহিত্যের প্রকাশ মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেন। কিন্তু তারা কখনোই বাংলাকে সীমিত অর্থ ব্যতীত পৃথক একটি পরিচয় হিসেবে গ্রহণ করেন নি। বাঙ্গালী মুসলমানরা তাদের ইসলামী পরিচয় নিয়ে অনেক সচেতন ছিলেন। এটা ঠিক, চৌদ্দ শতকের ইংরেজ কবিকুল, যেমন চসার মনে করতেন তারা বৃহত্তর ইউরোপিয় খৃষ্টমণ্ডলীর (European Christendom) অন্তর্ভূক্ত। বাঙ্গলী মুসলমানের এই ব্যাপারটা বোঝা না গেলে ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ শতক এমনকি তার পরের ঘটনাবলী আমাদের সামনে যথার্থভাবে স্পষ্ট হবে না।

মোহর আলী তাঁর বইতে বাঙ্গালী মুসলমানের নৃতাত্বিক গঠন ও উৎপত্তি সম্বন্ধে বলেছেনঃ বাংলায় অভিবাসী মুসলমানের সংখ্যা স্থানীয়ভাবে ধর্মান্তরিত মুসলমানদের চাইতে বেশী।[১২]

তাঁর এ বক্তব্যের সাথে উনবিংশ শতাব্দীর মুসলিম বুদ্ধিজীবী দেওয়ান ফজলে রাব্বীর মতামতের অনেকটা সাদৃশ্য দেখা যায়। দেওয়ান ফজলে রাব্বী হাকিকত এ মুসলমান-ই-বাঙ্গালাহ[১৩]নামে একটি ফার্সী কিতাব লেখেন ১৮৯৫ সালে, যা পরবর্তী কালে ইংরেজী ও বাংলায় তরজমা হয়। এ বইয়ে তিনি ব্রিটিশ প্রশাসক হার্বাট রিজলীর[১৪]মতানুসারে অধিকাংশ বাঙ্গালী মুসলমান নিম্নবর্ণের হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত হয়েছেন- যুক্তি ও উপাত্তসহ এ কথার প্রতিবাদ করেন এবং প্রমাণ করার চেষ্টা করেন বাংলায় অভিবাসী মুসলমানের সংখ্যাই প্রধান।

রিজলী ও রাব্বী উভয়ের যুক্তিতে সারবত্তা ছিল কিন্তু কোন্‌টি চূড়ান্ত এটা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিস্তর মতান্তর আছে। মোহর আলী সাহেব অভিবাসী মুসলমানের সংখ্যা বেশী ধরলেও রাব্বীর মত তিনি অনড় কোন যুক্তি নিয়ে বসে থাকেন নি। তিনি অন্যান্য সূত্র উল্লেখ করে বলেছেন- বাঙ্গালী মুসলমানের মধ্যে যথেষ্ট সংখ্যক মানুষের ধমনীতে দেশী-বিদেশী রক্তের যেমন সংমিশ্রণ ঘটেছে তেমনি হিন্দু ও অন্যান্য ধর্ম থেকে ধর্মান্তরের ঘটনাও ঘটেছে।

> মোহর আলীর বইতে আরেকটি জিনিস লক্ষ্যণীয়। বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন বাংলার মসলমানরা এককভাবে ইসলাম বা হিন্দুধর্মের ফসল নয় বরং লোক সংস্কৃতির ফসল। বাংলার লোকজ ইসলামের সাথে ইসলামের নিয়ম নীতির সম্পর্ক ছিল না বললেই চলে। এরা মনে করেন বাংলার ইসলাম তাই সমন্বয়বাদী। এরা তাদের তত্ত্বের পক্ষে অসীম রায়[[১৫]ও রিচার্ড এম ইটনের[১৬]যুক্তিকে সামনে নিয়ে আসেন। মুশকিল হচ্ছে রায় ও ইটনের যুক্তিতে মারাত্মক দূর্বলতা রয়েছে যা মোহর আলীর বর্ণনা থেকে বোঝা যায়। রায় ও ইটন তাদের যুক্তির মশলা যোগাড় করেছেন মূলতঃ মধ্যযুগের নির্দিষ্ট সংখ্যক কবিদের সমন্বয়বাদী লেখালেখি থেকে। কিন্তু মোহর আলী দেখিয়েছেন মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বিচ্ছিন্নতারও যথেষ্ট উপাদান রয়েছে। শুধু তাই নয় রায় ও ইটনের তত্ত্বে সমন্বয়বাদী ঐতিহ্যের প্রমাণ হিসেবে পীরবাদের উপর জোর দেয়া হয়েছে। কিন্তু সে কালে নূর কুতুবুল আলমের মত আচারনিষ্ঠ অসংখ্য মুসলিম পণ্ডিতরাও যে ছিলেন তা তারা উপেক্ষা করেছেন।

মোহর আলীর লেখা থেকে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে ইটন ইসলামের ধর্মীয় ভাবাদর্শ ও ধর্মান্তরের গুরুত্বকে খাটো করে দেখেছেন। বরাবরই মুসলিম সমাজ পরিচালিত হতো ইসলামী অনুশাসন দ্বারা এবং এটি মুসলিম সমাজকে যেমন স্বাতন্ত্র্য দিয়েছিল তেমনি সমন্বয়বাদের স্থূল ধারণাকে এটি গ্রহণ করেনি। বাউল, কর্তাভজার মত দলের লোকজন মুসলিম সমাজ দূরে থাকুক আম হিন্দু সমাজের কাছেও তেমন গ্রহণীয় হয়নি।

মোহর আলীর বইয়ের আরেকটি বৈশিষ্ট হচ্ছে তিনি ব্রিটিশবিরোধী আজাদী সংগ্রামে মুসলমানদের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকাকে

বিস্তারিতভাবে তুলে এনেছেন। রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর বাংলাদেশের ইতিহাস বইয়ে পলাশী উত্তর কলকাতা কেন্দ্রিক বাঙ্গালী হিন্দুদের কর্মকাণ্ডকে যেভাবে উচ্চকিত করেছেন কিংবা সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের মাহাত্ম প্রদান করেছেন, ব্রিটিশ বিরোধী মুসলিম বিপ্লবীরা তাঁর কাছে তেমন কোন আবেদন সৃষ্টি করেনি। মজুমদার সাহেব মনে করতেন ভারতে ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রাম শুরু করে ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী, প্রধানত এরা ছিল হিন্দু এবং বঙ্গ-ভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের ভিতর দিয়ে তা পূর্ণতা অর্জন করে। স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলমানদের অবদানকে তিনি স্বীকৃতি দিতে চাননি।[১৭]মোহর আলী সাহেব ব্রিটিশ বিরোধী মুসলিম বিপ্লবীদের নিরন্তর সংগ্রামকে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্যভাবে পাঠকদের সামনে হাজির করেছেন। বাংলার ফকীর বিদ্রোহ, ফরায়েজী আন্দোলন, তিতুমীরের লড়াই, কৃষক বিদ্রোহ, জিহাদ তথা ওহাবী আন্দোলনের গৌরব গাঁথার অসাধারণ দক্ষতার সাথে লিপিবদ্ধ করেছেন।

মোহর আলীর এই ইতিহাস গ্রন্থটি মূলতঃ বাঙ্গালী মুসলমানের ঐতিহাসিক আত্মপরিচয়ের দলিল। বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদী কিংবা ভারতীয় জাতীয়তাবাদী ঘরানার লেখক ঐতিহাসিকদের প্রচারণার কল্যানে সাধারণ বাঙ্গালী মুসলমানদের মধ্যে একটা হীনমন্যতা তৈরী হয়েছে এই ভেবে যে- বাংলার মুসলিম সমাজ, ইতিহাস ও তাঁর প্রতিভূরা হচ্ছে দখলদার। প্রাক মুসলিম শাসক ও সমাজনেতা হচ্ছে তাদের প্রকৃত বীর। বাংলার মুসলিম ইতিহাস হচ্ছে দখলদারদের সাম্প্রদায়িক ইতিহাস।

মোহর আলীর ইতিহাস বইটি বাঙ্গালী মুসলমানের এই হীনমন্যতার কুয়াশা ভেদ করতে পেরেছে বলে ধরে নেয়া যায়। পাশাপাশি এ বইটির আয়নায় বাঙ্গালী মুসলমান তার আপন অস্তিত্বকে দেখতে পারবে। এতদিন যে চেহারা তার নয় সেটিকে সে নিজের চেহারা বলে দাবী করে এসেছে। এ বইটি সে ভুল ভাঙ্গাবে।

৪

ওরিয়েন্টালিজম বা প্রাচ্যবিদ্যার চর্চা এক সময় ঔপনিবেশিক স্বার্থে পশ্চিমের দেশগুলোতে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। পশ্চিমারা কিভাবে ইসলাম ও মুসলমানদের নিয়ে প্রচার প্রপাগান্ডা চালায় তার একটি বুদ্ধিবৃত্তিক ডিসকোর্স হিসেবে তত্বটিকে খাড়া করা হয়েছিল। পাশ্চাত্য কীভাবে ইসলাম কিংবা মুসলমান জনগোষ্ঠীকে দেখে ও বিচার বিবেচনা করে, সেই দেখা ও বিচারবোধের মধ্যে যে দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গির কারণে পাশ্চাত্য ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে দুশমনি করে। প্রাচ্যবিদ্যার বয়ান নতুন করে আমাদের কাছে স্পষ্ট করেছে কেন পশ্চিমারা রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক ও মিডিয়া সব ফ্রন্টে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বিগ্রহ চালায়। মুসলিম দেশগুলোতে ঔপনিবেশিক শাসনের মাত্রা যত বেড়েছে, পশ্চিম থেকে প্রাচ্যবিদ্যার বয়ান তত স্ফীত হয়েছে এবং ইসলামের মর্যাদাকে খাটো করার জন্য তারা বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে এর বিরুদ্ধে নিষ্ঠুর আক্রমণ চালিয়েছে। বিশেষ করে ইসলামের নবী ও পবিত্র গ্রন্থ কুরআনের উপর আক্রমণ শানিয়েছে সবচেয়ে বেশী। কারণ তারা জানে এ দুটির উপর ইসলামের বুনিয়াদ দাঁড়িয়ে আছে। সুতরাং এই বুনিয়াদকে দুর্বল করতে পারলে ইসলামপ্রধান জনগোষ্ঠীকে সহজে নিয়ন্ত্রন করা সম্ভব হবে।

অধ্যাপক মোহর আলী প্রাচ্যবিদদের এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। বিশেষ করে ইসলামের নবী ও পবিত্র কুরআন নিয়ে তাদের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিগুলোকে সবার সামনে তুলে ধরেছেন। প্রাচ্যবিদদের এই নেতিবাচক কৌশলগুলোকে চিহ্নিত করার পিছনে মোহর আলীর মধ্যে একধরনের Missionary Polemism কাজ করলেও আজকের দিনেও এর প্রাসংগিকতাকে উড়িয়ে দেয়া যায় না। কারণ আঠার-উনিশ শতকের ইসলাম ও মুসলমান জনগোষ্ঠী নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী প্রপাগান্ডা আজও বহমান রয়েছে এবং মুসলিম জনপদগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার পশ্চিমা খেয়াল অন্তর্হিত হয়নি। এই প্রপাগান্ডার বাইরের কাঠামো বদলালেও ভিতরের মর্মবস্তু একই রয়ে গেছে। তাই আজকের দিনেও সাম্রাজ্যবাদকে চিনতে ও বুঝতে হলে বিশেষ করে এর ঐতিহাসিক পরম্পরাটা ধরতে হলে মোহর আলীর গবেষণা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। মোহর আলী এ বিষয়ে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বই লিখেছেন যা একটিকে আরেকটির পরিপূরকও বলা যায়। প্রথমটি হচ্ছে Sirat Al Nabi and the Orientalists এবং দ্বিতীয়টি The Quran and the Orientalists: An Examination of Their Main Theories and Assumptions. প্রথমটিতে তিনি প্রধানতঃ উইলিয়াম মুর (১৮০৯-১৯০৫), ডি এস মারগোলিয়ূথ (১৮৫৮-১৯৪০) এবং উইলিয়াম মন্টগোমারী ওয়াট (১৯০৯-২০০৬) কৃত রসূল চরিতের নেতিবাচক দিকগুলোর অসারতা উন্মোচন করেছেন এবং এর তথ্য ম্লান করবার জন্য গবেষণার পোষাকী ভাষায় আড়ালে শক্তভাবে বিরুদ্ধ প্রপাগান্ডা চালিয়ছেন। যেমন রসূলের শৈশবকালে শাক-আল-সদর বক্ষবিদারণের ঘটনাকে এরা বলেছেন মৃগী রোগ, তরুণ বয়সে রসূলের হাতে গড়া প্রতিষ্ঠান হিলফুল ফুযুলকে বলেছেন ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত, রসূলের ওহীপ্রাপ্তি প্রসঙ্গে বলেছেন কুরআন শরীফ হচ্ছে তাঁর নিজস্ব রচনা ইত্যাদি।

একই ভাবে দ্বিতীয় বইটিতেও মোহর আলী প্রাচ্যবিদদের কোরআন শরীফ সম্পর্কে নেতিবাচক মূল্যায়নকে উন্মোচন করেছেন। কুরআন সম্পর্কে প্রাচ্যবিদদের দৃষ্টিভঙ্গী মূলতঃ নিম্নোক্ত জিনিসগুলো প্রাণপণে প্রমাণ করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছেঃ ১। যেহেতু

মোহাম্মদ ছিলেন উচ্চভিলাষী, তাই কুরআন শরীফ রচনায় তিনি দীর্ঘ সময় নিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে তিনি তাঁর কবিত্ব শক্তিকে ব্যবহার করেছিলেন। ২। তিনি পুরোপুরি নিরক্ষর ছিলেন না, উম্মী শব্দটা ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবহৃত হয়েছে। ৩। কুরআন রচনায় তিনি ইহুদী ও খৃস্টীয় ঐতিহ্য ধার করেছিলেন। ৪। কোরআনে সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক ত্রুটিগুলো যেমন দেখা যায় তেমনি অনেক বিদেশী ও ব্যবসায়িক পরিভাষা দেখা যায় যা তিনি কুরআন রচনার সময় ঢুকিয়েছেন। ৫। ওহীকে প্রাচ্যবিদরা বলেছেন Intellectual location বুদ্ধিবৃত্তিক বাকশৈলী। ৬। কোরআন সংকলন ও গ্রন্থনার যথার্থতা নিয়ে তাঁর অহেতুক সংশয় ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছেন।

মোহর আলী রসূল ও কোরআন সম্বন্ধে উপরোক্ত অভিযোগ প্রসঙ্গে বলেছেন এই সমালোচনা রসূলের যুগ থেকে চলছে। ঐতিহাসিক কাল ধরে চলা সমালোচনার এই পরস্পরার মধ্যে কোন বৈচিত্র নেই। এর একটি উদ্দেশ্য ইসলাম ও তার নবীকে কলঙ্কিত করা। মোহর আলী লিখেছেনঃ Ever since the time of the Prophet unbelievers and critics have merely rehearsed the Mekkan unbelievers view about the Quran. And since the middle of the nineteenth century modern European scholars, the orientalists, have repeated the same objections and urgumerts.[১৮]

এডওয়ার্ড সাঈদ তাঁর Orientalism নামক কেতাবে প্রাচ্যবিদ্যার সাম্রাজ্যবাদী অভিসন্ধি সম্ভন্ধে একটি সাধারণ ডিসকোর্সকে তুলে ধরেছেন। এই বয়ানের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী অভিন্ধিকে তুলে ধরা হয়েছে সত্য কিন্তু বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে সুনির্দিষ্টভাবে তা চিহ্নিত করা হয়নি। মোহর আলী ইসলামের নবী ও কোরআন শরীফ সম্পর্কে প্রাচ্যবিদদের অভিসন্ধির মূল্যায়ন করেছেন এবং এর চুলচেরা বিশ্লেষণ করে সুনির্দিষ্টভাবে তাদের অভিযোগগুলোকে যৌক্তিকতাঁর সাথে খারিজ করেছেন। মোহর আলীর প্রাচ্যবিদ্যার চর্চার তাৎপর্য এখানেই।

৫

মোহাম্মদ মোহর আলী কৃত কুরআন শরীফের তরজমার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট লক্ষ্যণীয়। এই তরজমা প্রচলিত ইংরেজী তরজমার মতো নয়। এই সব তজমার সাধারণ বৈশিষ্ট্ হচ্ছে একটি কলামে কোরআনের আয়াতটি থাকে, পাশাপাশি অন্য একটি কলামে থাকে ঐ নির্দিষ্ট আয়াতের অর্থ। এই পদ্ধতিতে যে কোন পাঠক অবশ্য আয়াতের সার্বিক অর্থটা ধরতে পারেন। কিন্তু একজন আরবী জানা পাঠকের কাছে কোন্ আরবী শব্দের অর্থে কোন্ ইংরেজী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে তা বোঝা বেশ কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে।

মোহর আলী তাঁর তরজমার আয়াতের একটি বা একের অধিক শব্দকে কলামের একটি লাইনে রেখে, এর ইংরেজী অর্থ পাশের কলামে এমনভাবে দিয়েছেন যাতে ইংরেজী তরজমার ধারাবাহিকতা ব্যাহত না হয়। এই পদ্ধতিতে কুরআনের শব্দটির পুঙ্খানুপুঙ্খ অর্থ রক্ষা করা হয়েছে। কোন শব্দের অর্থ যাতে বাদ না পড়ে তা খেয়াল রাখা হয়েছে এবং ভিন্ন কোন অর্থ যাতে ঢুকে না পড়ে তাঁর ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে।

কুরআন শরীফকে আরো ভালোভাবে বুঝবার জন্য প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দের অর্থ এখানে পৃথকভাবে দেয়া হয়েছে। এটা করার জন্য ইংরেজী শব্দের উপরে একটি সংখ্যা দেয়া হয়েছে এবং কুরআনের এর পরিপূরক শব্দটির অর্থকে সাধারণ অর্থের বাইরে ভিন্ন একটি কলামে দেয়া হয়েছে। এখানে শব্দটির পাশাপাশি বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেও বুঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে। তাই বলা যায় মোহর আলীর এ তরজমাটি আয়াতের তাফসীর না হয়ে কুরআনের ব্যবহৃত শব্দের তাফসীর হয়েছে।

এছাড়া এখানে রয়েছে ব্যাকরণগত টিকা বিশেষ করে ক্রিয়া ও ক্রিয়াযুক্ত বিশেষ্যগুলোর ব্যাখ্যা। যে সব শব্দ বিভিন্ন পৃষ্ঠায় বারবার এসেছে সেক্ষেত্রে প্রেক্ষাপট অনুযায়ী অর্থ ও ব্যাকরণগত টিকাও বারবার দেয়া হয়েছে। বিশেষ করে পিছনের সদৃশ শব্দের সূত্রকেও উল্লেখ করা হয়েছে যাতে পিছনের কোন পৃষ্ঠা ও নাম্বারের অধীন বিবৃত হয়েছে তা বোঝা যায়। এই পুনরাবৃত্তি পাঠককে নির্দিষ্ট শব্দটির অর্থ বুঝতে সাহায্য করে। অন্যান্য ভাষার মতো আরবী ভাষায়ও এমন শব্দ আছে যার বিভিন্ন অর্থ হতে পারে। এখানে এই বিশেষ শব্দের বিভিন্ন অর্থকে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। একইভাবে একটি শব্দের একাধিক ইংরেজী অর্থ দেয়া হয়েছে যাতে পাঠক নির্দিষ্ট আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে শব্দের অর্থ ও তাৎপর্য পৃথক ভাবে বুঝতে পারে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে অনারব পাঠকের জন্য কুরআন বুঝা সহজ হয় এবং পাঠকের কুরআনের ভাষাজ্ঞান বৃদ্ধি পায়।

এতে শব্দের অর্থের পাশাপাশি প্রয়োজন অনুসারে ব্যাখ্য-টীকাও দেয়া হয়েছে। যদিও এটা সীমিত পর্যায়ে রাখা হয়েছে এবং কিছু নির্দিষ্ট তাফসীরের ভিত্তিতেই তা করা হয়েছে। আব্দুল্লাহ ইউসুফ আলী ও মোহাম্মদ আসাদের মতো মশহুর তাফসীরকারগণ আয়াতের পাশাপাশি কুরআন শরীফের বিশেষ বিশেষ শব্দের ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। এসব ব্যাখ্যার সময় তাঁদের একধরণের মৌলিক প্রতিভার স্ফুরণ ঘটেছে। বিশেষ করে তাতে এক ধরনের সৃজনশীলতার আভাস দেখা যায়। এই কারণে তাঁদের তফসীরের বিশ্লেষণ বিচিত্রগামী হয়েছে। মোহর আলীর ক্ষেত্রে সেটা দেখা যায় না। কারণ তিনি কুরআনের আক্ষরিক অর্থের উপর বেশী জোর দিয়েছেন এবং ব্যাখ্যার সময়ও এটিকে কাছাকাছি রাখতে চেয়েছেন। দীর্ঘদিন সৌদি আরবে প্রবাস জীবন যাপনের কারণে তাঁর চিন্তা ভাবনার উপর সম্ভবতঃ literalist ব্যাখ্যার একটা প্রভাব পড়েছে বলে মনে হয়। এই তরজমার মধ্যে তাঁর আভাস কিছুটা দেখতে পাওয়া যায়। যাই হোক সাধারণ পাঠকের জন্য বিশেষ করে আরবী বুঝে কুরআন শরীফ পাঠের জন্য তরজমাটি যথেষ্ট উপযোগী বলে বিশ্বাস করার কারণ আছে।

৬

রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক চিন্তার দিক দিয়ে মোহর আলী উপমহাদেশীয় প্রেক্ষিতে ছিলেন মুসলিম জাতীয়তাবাদী এবং আন্তর্জাতিক পরিসরে মুসলিম উম্মাহর (আন্তর্জাতিকতাবাদের) ভাবনায় আস্থাশীল। একজন উঁচু মাপের ঐতিহাসিক ও ইসলামী পণ্ডিত হিসেবে তিনি একই সাথে এই দুই পরিচয়কে লালন করেছেন। তাঁর এই বিশ্বাসের মধ্যে কোন গোঁজামিল ছিল না। নিজের জীবনের বিপর্যয় ও বৈরী সময়ের মধ্যেও তিনি এই পরিচয়কে সমুন্নত রাখতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি। বরং একজন বিশ্বাসী মানুষের মতো তাঁর সামাজিক দায়বোধকেও রক্ষা করেছেন। এই দায় থেকেই তিনি বাঙ্গালী মুসলমানের ইতিহাসের সবচেয়ে প্রামাণ্য মনুমেন্টটি খাড়া করেছেন এবং ইতিহাসের জায়গা থেকে বাঙ্গালী মুসলমানের আত্মপরিচয়ের মূর্ত করেছেন।

অন্যদিকে পাশ্চাত্য থেকে ধেয়ে আসা মুসলিম জনপদের উপর বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনকে মোকাবেলা করার পথ ও পন্থা খুঁজে দেখার চেষ্টা করেছেন। বিশেষ করে মুসলিম সংস্কৃতির প্রাণ যে কুরআনের মধ্যেই বীজাকারে নিহিত আছে তা যথাযথভাবে তুলে ধরার জন্য তিনি আমজনতার ভাষায় কোরআনের তরজমা উপস্থাপন করেছেন।

ইতিহাসের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের ভেতর দিয়ে মুসলিম সমাজ টিকে আছে। এর কারণ কুরআনের ঐকাত্মসাধক সংস্কৃতি মুসলমানদের প্রবল প্রতিপক্ষের সামনেও অটল থাকতে সাহায্য করেছে। মোহর আলী আজীবন এই ঐকাত্মসাধক সংস্কৃতির সাধনা করে গেছেন।

তথ্য সূত্রঃ

[১] নাসির হেলাল, স্মৃতিতে অম্লান যারা। অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি।

[২] প্রাগুক্ত

[৩] MAJ Baig, Muhammad Mohar Ali www.BMRI.org.uk

[৪] Ibid

[৫] Ibid

[৬] Ibid

[৭] Asia post, 16th May, 2007.

[৮] Jadu Natu Sarkar, History of Bengal, vol: II, Dacca: University of Dacca 1976.

[৯] Syed Sajjad Hussain, New light on Muslim Bengal; Impact International Magazine, London, 1989.

[১০] Muhammad Mohar Ali, History of the Muslims of Bengal, vol/A. Ryadh: Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University, 1985.

[১১] Ibid

[১২] Muhammad Mohar Ali, History of the Muslims of Bengal, vol/B.

[১৩] খন্দকার ফজলে রাব্বী, বাংলার মুসলমান, আব্দুর রাজ্জাক অনূদিত। ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৬।

[১৪] Sir Herbert Risley. The Rise of Islam. Calcutta: Thacker, Spirnk and company, 1915. উদ্ধৃতঃ আকবর আলী খান, বাংলাদেশের সত্তার অন্বেষা। ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ২০০৪।

[১৫] Asim Roy, The Islamic Syncretistic Tradition in Bangla. Dhaka: Academic Publishers, 1983.

[১৬] Richard M. Eaton, The Rise of Islam and the Bengal Frontier, 1204-1760, Delhi: Oxford University Press, 1994.

[১৭] রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড ও চতুর্থ খণ্ড। কলিকাতাঃ জেনারেল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৭৫।

[১৮] Muhammad Mohar Ali, The Quran and the Orientalists: An Examination of Theirs Main Theories and Assumptions. Suffolk: Tamiyat Ihyaa Minhaj Ali Sunnalhs, 2004.

ফাহমিদ-উর-রহমান

ফাহমিদ-উর-রহমান একজন মননশীল প্রাবন্ধিক ও বুদ্ধিজীবী। পেশায় মনোরোগ বিশেষজ্ঞ হলেও ইতিহাস, সংস্কৃতি, ধর্ম, সমাজ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে তিনি লিখছেন। সমাজ ও সংস্কৃতি সচেতন বিধায় তিনি আধুনিকতার সমস্যা নিয়ে লিখেছেন। আধুনিকতা ও সাম্রাজ্যবাদের সমস্যা থেকে উত্তরণের পথ নিয়েও তিনি কথা বলেছেন। তার ঋদ্ধ লেখালেখি নতুন আঙ্গিকে বাঙালি মুসলমানের জাতিসত্তার উপরে আলোকপাত করেছে। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের নামঃ ১। ইকবাল মননে অন্বেষণে (১৯৯৫) ২। অন্য আলোয় দেখা (২০০২) ৩। উত্তর আধুনিকতা (২০০৬) ৪। সেকুলারিজমের সত্য মিথ্যা (২০০৮) ৫। উত্তর আধুনিক মুসলিম মন (২০১০) ৬। সাম্রাজ্যবাদ (২০১২) ৭। বাংলাদেশ জিন্দাবাদ (২০১৩) ৮। সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ও বাংলাদেশ (২০১৪) পাশাপাশি তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে ১। জামাল উদ্দীন আফগানী: নব প্রভাতের সূর্য পুরুষ (২০০৩) ২। মহাবিদ্রোহ ১৮৫৭ (২০০৯) ৩। ফরায়েজী আন্দোলন : আত্মসত্তার রাজনীতি (২০১১)